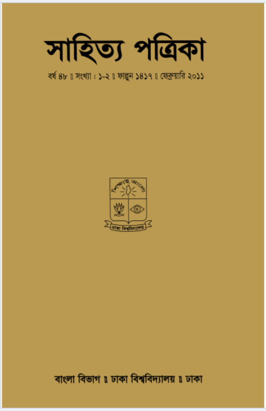

Vol. 48 | No. 1-2 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

'আবেহায়াত' উপন্যাসে বাঙালি মুসলমান সমাজের ধর্মীয় ক্রমবিকাশ

Volume	48
Issue	1-2
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মো. চেঙ্গীশ খান
Published online	April 9, 2025
DOI	10.62328/sp.v48i1-2.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v48i1-2.10
Pages	167-187
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

‘আবেহায়াত’ উপন্যাসে বাঙালি মুসলমান সমাজের ধর্মীয় ক্রমবিকাশ

মো. চেঙ্গীশ খান*

এক.

উপন্যাস আধুনিক যুগের সৃষ্টি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে উপন্যাসের সৃষ্টি সম্ভব ছিল না, কেননা তখন মানুষের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধের সৃষ্টি হয়নি। কালের বিবর্তনে ধর্মের বেড়াজাল ছিন্ন করে যখনই মানুষ নিজেকে একটা স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে আবিষ্কার করল এবং শিক্ষাদীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও সর্বোপরি মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মনির্ভরশীল ও মুক্তমনের অধিকারী হতে শুরু করল, মূলত তখন থেকে আধুনিকতার দিকে আমাদের যাত্রা শুরু। “ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্বোধন উপন্যাস-সাহিত্যের একটি অপরিহার্য শর্ত। মধ্যযুগের মানুষ কতগুলি সুনির্দিষ্ট সামাজিক বিন্যাসের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সেখানে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ ছিল রুদ্ধ। মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডল থেকে মানুষের মুক্তির চেতনাই আধুনিকতার সূচক।”[১] উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের পথ পেরিয়ে বাঙালি মুসলমান সমাজে যে জাগরণ পরিলক্ষিত হয় তাতেও একটা বড়ো বাধা ছিল ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতা। ধর্মীয় বিশ্বাসের আবরণে পীরপ্রথা বা পীরকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা ও ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থার ধারা থেকে আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীতে উত্তরণ ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজের জাগরণের একটা বিশেষ দিক। বিশ শতকের প্রথমার্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনের সমান্তরালে সামাজিক-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এই বিশেষ দিকটির অন্যতম পুরোধা ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)। এ সময়ে মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান সমাজ পীরকেন্দ্রিক চিন্তাচেতনা ও পশ্চাৎপদ শিক্ষাব্যবস্থার মানসিকতা থেকে কীভাবে প্রগতিশীল মানসিকতায় রূপান্তরিত হচ্ছিল আবুল মনসুর আহমদের *আবেহায়াত* (১৯৬৮) উপন্যাসে সেই সামাজিক ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

সাহিত্যজগতে আবুল মনসুর আহমদের খ্যাতি একজন ব্যঙ্গকার হিসেবে। সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি ও অর্থনীতির নানান অসংগতির খণ্ডিত চিত্রকে তিনি ব্যঙ্গগল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করেছেন, আর এসব বিষয়ের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্রায়ণ তাঁর উপন্যাসগুলো। ব্যক্তিজীবনে রাজনীতি ও সাংবাদিকতার মিশ্রণে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছেন তার প্রতিফলন দেখা যায় উপন্যাসে। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা তিন, যথা— *জীবন-ক্ষুধা* (১৯৫৫), *সত্যমিথ্যা* (১৯৫৩) ও *আবেহায়াত* (১৯৬৮)। *সত্যমিথ্যা* উপন্যাসটি লেখকের মৌলিক রচনা নয়, এটি জোহান বোয়ারের *দি পাওয়ার অব এ লাই*-এর বাংলা রূপান্তর।[২] আবুল মনসুর আহমদের তৃতীয় এবং শেষ উপন্যাস *আবেহায়াত* (১৯৬৮) গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে ঢাকার ‘মাসিক মোহাম্মদী’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়েছিল।[৩] “পূর্ব-বাংলার গ্রামীণ সমাজ-জীবনে পীরপ্রথা ও পীরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি, গ্রামবাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মশিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষার দ্বন্দ্ব-সংঘাত অবলম্বনে

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

আবেহায়াত রচিত। আবেহায়াত শব্দের অর্থ fountain of life।"[৪] কেন্দ্রীয় চরিত্র হামিদের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন যে, কীভাবে একজন মানুষ ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামির পরিবেশ থেকে নিজেকে ক্রমান্বয়ে মুক্ত করে আধুনিক চিন্তা-চেতনার পথে পা বাড়ায়। সেই সঙ্গে ধর্মান্ধতা ও পীরালি ব্যবসায়ের পতনের একটা চিত্রও এখানে স্পষ্ট। "বর্ণনায় লেখকের তির্যক দৃষ্টিভঙ্গিই অধিক সক্রিয়, বস্তুতঃ সমাজ-চেতনার কিংবা বিদ্রূপের কশাঘাতে সামাজিক মানুষের সংশোধনের একটি প্রবল বাসনা এতে ধরা পড়ে। তাই এ উপন্যাসে তিনি সত্যের সন্ধানে অনেক ক্ষেত্রেই 'আয়না'র রূপকার রূপে পুনরাবির্ভূত হয়েছেন বললে অত্যুক্তি হবে না।"[৫] বিশ শতকের মধ্যভাগের মুসলমান-সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও পীর-প্রথা থেকে মুক্তির উদগ্র আকাঙ্ক্ষাই *আবেহায়াত* উপন্যাসের মূল বিষয়।

দুই.

আবেহায়াত উপন্যাসটি পালা আকারে বর্ণিত এবং মোট চৌদ্দটি পালায় এটি শেষ হয়েছে। প্রতিটি পালার একেকটি নামকরণ করেছেন লেখক। প্রতিটি পালা আবার বিভিন্ন উপ-পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের কথা স্মরণ করা যায়। তিনি তাঁর প্রায় সব উপন্যাসের প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের একটা স্বতন্ত্র নামকরণ করেছেন। আবুল মনসুর আহমদ তাঁর *জীবন-ক্ষুধা* ও *আবেহায়াত* উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের এই রীতিকে অনুসরণ করেছেন। পালার শিরোনামটি দেখে পালার বিষয়বস্তু অনুমান করা যায়। তবে এতে উপন্যাসের শৈল্পিক মান ক্ষুণ্ন হয়নি। কেননা পড়ার আগে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে উপন্যাস পাঠে পাঠক তার কৌতূহল হারাতে পারেন। আবার পুরো উপন্যাসটি পাঠ না করে শুধু শিরোনাম দেখে পাঠক উপন্যাসের কাহিনী ও পরিণতি সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন। সে-ক্ষেত্রে উপন্যাসের রসোপলব্ধি থেকে পাঠকের বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি।

উপন্যাসের নায়ক হামিদের জন্মগ্রহণ থেকে শুরু করে পীর-পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে গোঁড়া রক্ষণশীল পরিবেশে তার বেড়ে ওঠা এবং আস্তে-আস্তে তা থেকে বেরিয়ে এসে পীরপ্রথাকে অস্বীকারের মাধ্যমে আধুনিক ধ্যান-ধারণাসম্পন্ন একজন মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার কাহিনী হচ্ছে এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু। তবে পরিণত বয়সে বিদেশি ডিগ্রিধারী ডাক্তার হামিদের মাধ্যমে লেখক কিছু অলৌকিক বিষয়কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেছেন, যাকে নায়কের গোঁড়া মানসিকতারই ভিন্ন রূপান্তর বলা যায়। অন্যদিকে এখানে লেখক পীর-পরিবারের পতনের একটি ইতিহাসও বর্ণনা করেছেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হামিদ, সে ফতেপুর পীরবংশের একমাত্র ছেলে-সন্তান। হামিদের পিতা খুবই নামকরা পীর। ঔপন্যাসিক শুরুতেই হামিদের পিতার বিশাল নামের মাধ্যমে পীরের প্রভাব-প্রতিপত্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন। পীরের নাম 'হযরত মওলানা মুর্শেদেনা শেখুল-মুসায়েখ শামসুল-আরেফিন সৈয়দুৎ-তালেবিন কুতুবে-দাওয়ান হাদিয়েযমান পীর দস্তগীর শাহ সুফি সৈয়দ আব্দুল আওয়াল সিদ্দিকী-আল কোরায়শী মাদ-যিলাহুল আলী সাহেব।' অতঃপর আমরা জানতে পারি, এই পীরের চার স্ত্রী এবং চার স্ত্রীর ঘরেই মেয়ে-

সন্তান। ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে পীর সাহেব মোট নয়টি মেয়ে সন্তানের পিতা হয়েছেন। তার মধ্যে পাঁচজন জন্মের সময়ে বা দু-চারদিনের মধ্যে মারা গিয়ে চারজন বেঁচে আছে এবং তাদের বিয়ে হয়েছে ও সন্তানাদি আছে। চার স্ত্রী, চার মেয়ে, তাদের জামাই ও নাতি-নাতনি থাকা সত্ত্বেও পীরের কোনো ছেলে-সন্তান না থাকায় তিনি খুব চিন্তিত। আর পীরের বংশ নির্বংশ হতে দেয়া যায় না, এ-কারণে পুত্র-সন্তানের আশায় তিনি আর একটি বিয়ে করতে চান। যেহেতু শরিয়ত অনুযায়ী চারটির বেশি বিয়ে করা সুন্নতের বরখেলাপ, তাই পীর সাহেব এক বিবিকে তালাক দিয়ে আরেকটি বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন এবং এক্ষেত্রে বড়ো বিবিকে তালাক দেয়াই তার কাছে যুক্তিসংগত মনে হয়। এখানে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, আসলে পুত্র-সন্তান লাভই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, বরং পীরের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আরেকটি নতুন বউ ঘরে আনা। ঔপন্যাসিক এখানে যেন একজন ব্যঙ্গকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। আমাদের সমাজে মোল্লা-মৌলবিদের একাধিক বিয়ে করার প্রবণতা লক্ষ করা যায় এবং অজুহাত হিসেবে চারটি বিয়ে করাকে তারা সুন্নত হিসেবে পরিগণিত করে ধর্মের সমর্থন নিয়ে তার অপব্যাখ্যা করে থাকেন। তাদের বদ্ধমূল ধারণা মেয়ে-সন্তানের জন্য স্ত্রীরাই দায়ী, আর এ-কারণে পুত্র-সন্তানের জন্য আরেকটি বিয়ে করা তাদের দৃষ্টিতে শরিয়তসম্মত। বিজ্ঞানবিদ্বেষী এসব মোল্লা ও পীরদের কুৎসিত চরিত্রের বিভিন্ন খণ্ডচিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় লেখকের বিভিন্ন ব্যঙ্গগল্পে, বিশেষ করে 'হুজুর কেবলা'য়। আর *আবেহায়াত* উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক একজন পীর ও পীর-পরিবারের একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। তবে আবুল মনসুর আহমদ এই উপন্যাসে একটি পীর-পরিবারের উত্থানের সঙ্গে-সঙ্গে তার পতনের ইতিহাসটিও দেখিয়েছেন।

নারীর প্রতি আকর্ষণ কিছু ভণ্ড পীরের সহজাত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তথাকথিত বৈধ উপায়ে সেটা তারা চরিতার্থ করেন। একসঙ্গে চার স্ত্রী বর্তমান থাকতেও তাই আরেকটি নতুন নারীর স্বাদ পাওয়ার জৈবিক লালসা পূরণের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করার একটা অস্ত্র তিনি হাতে পেয়ে যান। পীরের উত্তরাধিকারী না থাকলে লক্ষ-লক্ষ মুরিদের ইমান থাকবে না ও তারা বেহেশতেও যেতে পারবে না, অর্থাৎ মুরিদদের ইমান-রক্ষার্থে ও পরকালে বেহেশতে যাওয়ার স্বার্থেই পীর সাহেবের আরেকটি বিয়ে করা দরকার। কিন্তু তার অন্তরের বিষয়টা ঠিক উল্টো; মূলত জৈবিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই তিনি আর একটি বিয়ে করতে চান। যে পীর লক্ষ লক্ষ মুরিদের মনোবাসনা পূরণের জন্যে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন মাপের নজরানা নিয়ে থাকেন, এমনকি হয়ত কোনো নিঃসন্তান মুরিদের সন্তান লাভের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকেন— সেই পীর সাহেবের নিজের কোনো ছেলে নেই। পীরের ছেলে পীর হবেন —এই ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য পীর সাহেবের একটি ছেলে-সন্তান প্রয়োজন। কিন্তু চার স্ত্রী বর্তমান থাকায় তিনি আরেকটি বিয়ে করতে পারছেন না। এর সমাধান হিসেবে তিনি ত্রিশ বছরের ঘর করা বড়ো স্ত্রীর মৃত্যু কামনাও করেন কিন্তু সেটা একমাত্র আল্লাহর হাতে থাকায় তা সম্ভব নয়। তাই নিজের ক্ষমতায় যেটা করতে পারেন সেদিকে অগ্রসর হন অর্থাৎ এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আরেকটি বিয়ে করা। সেদিক থেকে বড়ো স্ত্রীকে তালাক দেয়াটাই তার কাছে সংগত মনে হয়, কেননা বড়ো স্ত্রীর বয়স বেশি হওয়ায় সন্তান ধারণের ক্ষমতা

হারানোর সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক জলুসও তিনি হারিয়েছেন। বড়ো স্ত্রীকে পীর সাহেব তার এই সিদ্ধান্ত জানানোর আগ-মুহূর্তেই জানতে পারেন তিনি সন্তানসম্ভবা। অবশেষে এক প্রচণ্ড ঝড়ের রাতে তার ঘরেই জন্ম হয় এক ছেলে-সন্তানের, আর সেই সঙ্গেই মারা যান মা। এই ছেলের নামই হামিদ —যে এই উপন্যাসের নায়ক।

তিন.

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন শুরুর আগে থেকেই ইসলাম ধর্মের প্রচারক হিসেবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুফি-দরবেশ ও তাঁদের অনুসারীদের আগমন ঘটেছিল এবং তাঁদের সাম্যনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বর্ণবৈষম্যে জর্জরিত নিম্নশ্রেণির হিন্দু ও বৌদ্ধরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। পরবর্তী সময়ে মুসলিম শাসকদের আনুকূল্যে এ ধারা অব্যাহত থাকে। কিছু বহিরাগত মুসলমান এদেশে বসবাস করতে থাকেন এবং কালক্রমে এঁরা অভিজাত শ্রেণি হিসেবে বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়। ১৮৭২ সনের আদমশুমারিতে দেখা যায়, বাংলার মুসলমান জনসংখ্যার ১.৫২ ভাগ হচ্ছে বহিরাগত মুসলমান এবং অবশিষ্ট সকলে ধর্মান্তরিত মুসলমান।[৬] বাঙালি হিন্দু বা বৌদ্ধদের মধ্য থেকে যারা মুসলমান হয়েছিল তাদের অধিকাংশই শুধু ধর্মটাকে গ্রহণ করেছিল, তাদের জীবনাচরণ, ভাষা, সংস্কৃতি ও চিন্তাচেতনার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। ফলে এরা শরিয়তি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে সুফি-দরবেশ দ্বারা প্রচারিত ও প্রভাবিত মারফতি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। ধর্মপালনের অংশ হিসেবে কোনো না কোনো পীরের মুরিদ হওয়ার রীতি এসময় থেকেই চলে আসছে। অলৌকিকতায় বিশ্বাস করা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। যথাযথ ধর্মপালন সত্যিই কষ্টকর। আর তাই সৃষ্টিকর্তাকে পাওয়ার সহজ উপায় হিসেবে মানুষ বিভিন্ন পীরের কাছে ছুটে যায়। সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে বা তার নির্দেশিত পথে ধর্ম পালন না করে সহজ পন্থা হিসেবে পীরের মুরিদ হলে পরকালে বেহেশত পাওয়ার পাশাপাশি ইহকালেও যথেষ্ট ধন-সম্পত্তির মালিক হওয়া যায়। "মানুষ যতই যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবী, প্রত্যক্ষনির্ভর হউক না কেন অলৌকিকে বিশ্বাস তাহার মজ্জাগত ধর্ম এবং কোন না কোন উপায়ে এই বিশ্বাস আত্মপ্রকাশ করিবেই। শুধু পরিবর্তিত আবহাওয়ায় অন্যান্য বিশ্বাসের মত এই বিশ্বাসও যুগে যুগে নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করে।"[৭] এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে পীরের দরগায় শিরনি দেওয়া, মানত করা, মোমবাতি জ্বালানো, সিজদা করা প্রভৃতির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার বিকল্প হিসেবে পীরকে মান্য করার বিভিন্ন রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত এবং এসবের প্রতি বাঙালি মুসলমানের আকর্ষণ বেশি দেখা যায়। মৃত পীর-দরবেশ-আউলিয়াদের কবরের ওপর মাজার নির্মাণ করে এক ধরনের ধর্ম-ব্যবসায়ী আজও এ ধারা অব্যাহত রেখেছে। আবার কেউ নিজেকে পীর দাবি করে কিছু মুরিদের সহায়তায় অলৌকিকতার তথ্য প্রচারের মাধ্যমে ধর্মভীরু মানুষকে প্রতারিত করে থাকে। আবুল মনসুর আহমদ তাঁর *আবেহায়াত* উপন্যাস ও বিভিন্ন গল্পে এ সমস্ত ভণ্ডপীর ও পীরপ্রথার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

ব্রিটিশরা মুসলমানদের কাছ থেকে এদেশের ক্ষমতা গ্রহণের কারণেই স্বাভাবিকভাবে ব্রিটিশদের প্রতি মুসলমানরা বীতশ্রদ্ধ ছিল এবং ব্রিটিশরাও মুসলমানদের দূরে সরিয়ে

হিন্দুদের কাছে টেনে নিয়েছিল। ফলে ব্রিটিশদের গৃহীত বিভিন্ন নীতি মুসলমানদের বিপক্ষে যায় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুসলমানরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছায়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়ায় মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতি প্রবেশ করায় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনেও অধঃপতন শুরু হয়। এদেশের অধিকাংশ মুসলমানই নিম্নবর্গের হিন্দু ও বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত হওয়ায় তারা তাদের পূর্বের সংস্কৃতির কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। ফলে নিম্নবিত্ত হিন্দু-মুসলমান সবাই সব-সময় তুর্কি-মুঘল শাসক ও স্থানীয় ব্রাহ্মণদের আজ্ঞাবাহী হিসেবেই কাজ করেছে।[৮] কিন্তু মুসলিম শাসনের পতনের পর ব্রিটিশ শাসকের অধীনে মুসলমানদের অধঃপতনের মূলে তারা নিজেদের কর্মফলকেই দায়ী করে এবং কিছু মুসলমান ধর্মগুরুর প্ররোচনায় এ ধারণা আরো বদ্ধমূল হয় যে, কুসংস্কারমুক্ত আদিম ও অকৃত্রিম ইসলামে প্রত্যাবর্তনই একমাত্র তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে। আর এ প্রেক্ষাপটেই মুসলমানদের ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত। এক্ষেত্রে আরবের মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাবের ধর্মীয় আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হাজি শরীয়তুল্লাহ, সৈয়দ আহমদ বেরেলভি ও তিতুমীর ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করেন।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দু-সমাজে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সৃষ্টি হলেও তার কোনো প্রভাব বাংলার মুসলমান-সমাজের ওপর পড়েনি। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম একশ বছরে বিভিন্ন সরকারি নীতি মুসলমানদের যেমন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়, তেমনি 'আদিম ইসলামে প্রত্যাবর্তনে'র নামে সংঘটিত বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলন ও ব্রিটিশবিরোধী চেতনা মুসলমানদের আধুনিকতা-বিমুখ করে রাখে। তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কিছু মুসলিম নেতার প্রচারণায় মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে এবং সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সহযোগী ভূমিকা, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতার কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের ফলে মুসলমানদের চেতনার পরিবর্তন হতে শুরু করে। "১৮৭০ খৃস্টাব্দের দিকে বাঙালী মুসলমানের মধ্যে বর্তমান সম্পর্কে সচেতনতা দেখা দেয় এবং আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে তার অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়।"[৯] মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান সমাজ কীভাবে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় রক্ষণশীলতা থেকে মুক্ত হয়ে প্রগতিশীলতার দিকে ধাবিত হল, *আবেহায়াত* উপন্যাসে রয়েছে তারই একটি বাস্তব চিত্র।

পীর-ব্যবসা যে অত্যন্ত লাভজনক তার চিত্র পাওয়া যায় এ উপন্যাসে। ফতেপুরের পীর এই ব্যবসার মাধ্যমে অঢেল ধন-সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। "তার নিজের জীবনেই একশ' একরের উপরে খামার জমি, দুইখানি তালুকের ষোল আনা ও একটি জমিদারির এক আনা অংশ খরিদ করিয়াছেন। শহরে পাঁচখানা ইমারত করিয়াছেন। তার তিনটি বাজারের মধ্যে। দোকান-ঘররূপে ভাড়া হয়। ভাড়া আসে মাসে তিনশ টাকা। বাকি দুইটি রেসিডেন্সিয়াল এলাকায়। ...পীর সাহেব নিজে অনেক হিসাব-পত্র ও যোগ বিয়োগ করিয়া দেখিয়াছেন খরচ-খরচাবাদে হরে-দরে-গড়ে পড়তায় শেষ পর্যন্ত পীর সাহেবের হাতে পৌঁছায় হাজার চল্লিশেক টাকা।"[১০] এমনিতে তিনি এত ধন-সম্পত্তির মালিক হননি।

এজন্য তাকে সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুভূতিকে চমৎকারভাবে কাজে লাগাতে হয়েছে। তাই অসংখ্য পীরের ভিড়ের মধ্যে কৌশলের প্রতিযোগিতায় তিনি শীর্ষে অবস্থান করছেন। প্রতি বছর ফতেপুরে উরস হয় এবং সেখানে এক লাখের মতো লোক হয়। পীর সাহেবের প্রভাব-প্রতিপত্তি এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, লোকমুখে প্রচলিত আছে— "পর-পর একনাগাড়ে তিনবছর ফতেপুর শরিফের উরস শরিফে যোগদান করিলে একটি হজের সওয়াব পাওয়া যায়। এক নাগাড়ে এগারটি উরসে-কূলে যোগ দিলে হজে-আক্‌বরীর সওয়াব হাসিল হয়।"[১১] এসব বর্ণনার মাধ্যমে লেখক সার্থক পীর ব্যবসার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের প্রথম দিকে বর্ণিত হয়েছে পীর ব্যবসার স্বরূপ ও হামিদের জন্মের কাহিনী।

আট বছর বয়সে পীর-বাড়ির মাদ্রাসায় হামিদের শিক্ষাজীবনের শুরু। হামিদের পিতা বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজ নসিহত করেন এবং হামিদকে সঙ্গে রাখেন। এ-সময়ে হামিদের মনে জাগে আবেহায়াতের পানি পান করবার মরণপণ সাধনা। লেখক উপন্যাসের অনেকটা অংশ জুড়ে হামিদের এই আবেহায়াতের পানি পান করার আধ্যাত্মিক সাধনার বর্ণনা দিয়েছেন। হামিদ আবেহায়াতের পানি ও সেই সঙ্গে পয়গম্বর সাহেব এবং 'খাজে-খেজের'কে স্বপ্নে দেখবার জন্য দিনরাত ইবাদত বন্দেগি করতে থাকে। "আবে-হায়াতের কুয়ার খোঁজ করিতে হইলে অন্তত খাবে খাজে-খেজেরের মোলাকাত দরকার, ...ডান হাতের শাহাদৎ আঙ্গুলে জাফরান লাগাইয়া সেই আঙ্গুলে নিজের বুকে 'মিম', 'হে' 'মিম' 'দাল' লিখিলে পয়গম্বর সাহেবকে, আর 'খে' 'যোয়াদ' 'বে' লিখিলে খাজে-খেজেরকে খাবে দেখা যাইবে।"[১২]

পরে আমরা দেখতে পাই, হামিদ যখন সিরাজগঞ্জ সিনিয়র মাদ্রাসায় পড়ে, তখন খাজে-খেজেরের দর্শন পাবার আশায় সে এক জঙ্গলের পাশে নদীর পাড়ে গিয়ে ধ্যান আরম্ভ করে। আমরা যদি ঔপন্যাসিকের *আত্মকথা* গ্রন্থের 'ধর্মজীবন' অংশটি পড়ি তাহলে এর সঙ্গে লেখকের নিজ জীবনের হুবহু মিল দেখতে পাই। সেখানে লেখক অনুরূপ ইবাদতের বর্ণনার পর বলেছেন— "আমার এই নফল ইবাদতের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল হযরত পয়গম্বর সাহেবকে দেখা। অন্ততঃ খাজে-খেজেরের সাক্ষাৎ পাওয়া আমার নফল ইবাদতের অপর প্রধান মকসুদ ছিল। জাফরানের কালীতে শাহাদাৎ আঙ্গুলে আরবী হরফে মোহাম্মদ লিখিয়া শুইতাম। ওই আমলের ফলে 'খাজে-খেজেরের' মোলাকাত পাইবার আশায় নদীর পাড় বা অন্যান্য সম্ভাব্য স্থানে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতাম। কিন্তু খাজে-খেজেরের সাক্ষাৎ পাইলাম না।"[১৩] তবে লেখক উপন্যাসের এ অংশে কথিত খাজে-খেজেরের রহস্যের উন্মোচন করেছেন। সিরাজগঞ্জ ওল্ড স্কিমের সিনিয়র মাদ্রাসার হোস্টেলে থাকার সময়ে হামিদ লেখকের ব্যক্তিজীবনের অনুরূপ অতিরিক্ত মাত্রায় ধর্ম পালনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পয়গম্বর সাহেব ও খাজে-খেজেরের সন্ধান পাওয়ার উদ্দেশ্যে হামিদ সারারাত ইবাদত-বন্দেগি করতে শুরু করে। "আইয়ামবাযের রোজা ও রাতের এবাদত কোনটাই ছাড়ে না। শবে-কদর, শবে-বরাত রবিউল-আউয়াল, এগারই রজব কোনটাই বাদ যায় না। এ ছাড়া এসব চাঁদের মাসেই নাকি অনেকগুলি আফযল রাত আছে। ওই সব রাতে এক রাকাত নামাজ পড়িলে সত্তুর রাকাতের সওয়াব পাওয়া যায়। এ সব রাতে হামিদ বিছানার সাথে

পিঠ লাগায় না।"[১৪] ফলে হোস্টেলের চার সিটের কামরায় হামিদের সাথে অন্য ছাত্র থাকতে না পেরে সিট ছেড়ে দেয়। তাই সে একাই একটা কামরায় থেকে ইবাদত-বন্দেগি করতে থাকে। মূলত তার এ ইবাদত ইসলামের মৌলিক কোনো কাজ নয়, বরং পয়গম্বর ও খাজে-খেজেরের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আজগুবি ধরনের একরকম ধ্যান। তার এই ধ্যান ভাঙে একটা ঘটনার পর। নদীর ধারের জঙ্গলে এ ধরনের এক ধ্যানের সময় তার বন্ধুরা নকল খাজে-খেজের সেজে হামিদকে ধোঁকা দিলে সে প্রচণ্ড লজ্জা পায়। ক্রমে ছাত্রদের মধ্যে বিষয়টি জানাজানি হলে হামিদ ওই মাদ্রাসায় আর টিকতে পারে না। অবশেষে সে মাদ্রাসা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। আবেহায়াতের পানি পানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলে তার মধ্যে এক ধরনের মানসিক পরিবর্তন আসে।

ওল্ড স্কিমের মাদ্রাসায় পড়ার সময় হামিদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে তার অদ্ভুত পোশাক পরিধানের বিষয়টিতেও লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। "সে (হামিদ) পোশাক-পরিচ্ছদে এমন কাঠামোল্লা যে মুদাররেসরা পর্যন্ত তার বাড়াবাড়িতে অসুবিধা বোধ করেন। ছাত্ররা তার পোশাক-পাতি লইয়া আড়ালে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। হামিদ হাঁটুর নিচে পর্যন্ত ঝুলওয়ালা কল্লিদার কোর্তা, টাখ্নোর 'চার আঙ্গুল উপরে চুড়িদার পায়জামা ও মাথা-চাপা পাঁচ কলি কাপড়ের টুপি পরে, ঈদ পর্বে ও সভা-সমিতিতেও হামিদ কোনদিন শেরওয়ানি আলিগড়ি পায়জামা ও তুর্কি টুপি পরে।"[১৫] হামিদের পোশাক নিয়ে বন্ধুরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে হামিদের জিদ তাতে আরো বেড়ে যায়। বিশেষ করে টুপি পরাতে সে একটু বাড়াবাড়িই করে। এক মুহূর্তের জন্যেও সে মাথা থেকে টুপি নামায় না। এমনকি টুপি পরে ঘুমায় এবং গোসল করার পর ভেজা কাপড় পরিবর্তনের আগে সে মাথায় টুপি পরে। আবুল মনসুর আহমদও ছাত্রজীবনে টুপি পরতেন এবং টুপি কখনো মাথা থেকে নামাতেন না। লেখক তাঁর *আত্মকথা*-য় বলেছেন— "এবাদত বন্দেগিতে আমার এই ধার্মিকতা আমার পোশাক-পাতিতে প্রকট হয়। টুপি ছাড়া আমি কোথাও যাইতাম না, স্কুলে-মক্তবে ত নয়ই। ক্লাশে কখনও মাথা হইতে টুপি নামাইতাম না। আমার টুপিটা ছিল লাল তুর্কি টুপি। ঐ ধরনের টুপিতে মাথায় বাতাস যাতায়াতের কোন রাস্তা ছিল না। গরমের দিনে ঘামে মাথা ভিজিয়া যাইত। কপাল, গাল, চিপ ও ঘাড় বাইয়া ঘাম পড়িত। তবু টুপি খুলিতাম না।"[১৬] লেখক তাঁর ব্যক্তিজীবনের টুপি-নিষ্ঠা ও খাজে-খেজেরের সাক্ষাৎ পাওয়ার চেষ্টাকে হামিদের চরিত্রে আরোপ করেছেন। ধর্মপালনের এই বাড়াবাড়িকে ব্যঙ্গ করে লেখক 'আহলে সুন্নত' নামের একটি ব্যঙ্গ গল্পও লিখেছেন। এ থেকে আমরা বলতে পারি যে, *আবেহায়াতের* হামিদের সঙ্গে আবুল মনসুর আহমদের নিজ জীবনের ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে। লেখক যেন হামিদ চরিত্রের মাধ্যমে নিজ-জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাই বর্ণনা করেছেন। তবে হামিদের মাধ্যমে লেখক তাঁর ব্যক্তিজীবনের ঘটনা বর্ণনা করলেও এখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, এটি প্রকৃত অর্থে কল্পনা ছাড়া আর কিছুই না।

চার.

হামিদের জীবনের পরিবর্তন আমরা লক্ষ করি সে যখন ওল্ড স্কিমের সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে নিউ স্কিমের হাই মাদ্রাসায় ভর্তি হয়। নিউ স্কিমের মাদ্রাসায় ভর্তির জন্য হামিদকে সংগ্রাম

করতে হয়। মানসিক পরিবর্তনের কারণে হামিদ এই সিদ্ধান্ত নেয়নি বরং ওল্ড স্কিমের মাদ্রাসায় পড়াকালীন সহপাঠীদের সঙ্গে তার সম্পর্কের দূরত্ব এবং কাল্পনিক খাজে-খেজেরের ধ্যানটি বন্ধুমহলের কারসাজিতে হাস্যকর প্রতীয়মান হলে এক ধরনের লজ্জা থেকেই সে মাদ্রাসা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে হামিদের এই মানসিক পরিবর্তনে মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। অল্পসময়ের মধ্যে সে প্রিন্সিপাল সাহেবের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে এবং একসময় সে মাদ্রাসা পরিবর্তনের কথা প্রকাশ করে। হামিদের মতো মেধাবী ছাত্রের এই সিদ্ধান্তকে তিনি স্বাগত জানান। "প্রিন্সিপাল সাহেব হামিদের মেধার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। বস্তুত তিনি যে হামিদকে অত স্নেহ করিতেন ও প্রশ্রয় দিতেন সেটা ফতেপুরের পীরজাদা বলিয়া নয়; হামিদের প্রতিভার জন্যই। তাঁর বিবেচনায় ফতেপুরের পীরযাদেগি হামিদের গুণ নয়, নির্গুণ। ওটা তার সুবিধা নয় অসুবিধা। তিনি অনেকবার মনে করিয়াছেন, হামিদের পুরাতন নেসাব ছাড়িয়া ইংরাজি লাইনে আসিতে বলিবেন। কিন্তু তা বলেন নাই শুধু তাঁর পৈতৃক ব্যবসা ও তার উত্তরাধিকারের কথা ভাবিয়া।"[১৭] হামিদ প্রিন্সিপাল সাহেবের কথা শুনে প্রথমে ইংরেজি লাইনে শিক্ষাগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও তার পিতার কথা চিন্তা করে শুধু ওল্ড স্কিম থেকে নিউ স্কিমের মাদ্রাসায় ভর্তি হয়। দুটো মাদ্রাসাই সিরাজগঞ্জে এবং তা পাশাপাশি অবস্থিত হওয়ায় হামিদ তার পিতার সম্মতি পাওয়ার আশা নিয়ে বাড়িতে আসে। প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া মাদ্রাসা পরিবর্তন করা যায় না। তাই পীর সাহেবের লিখিত সম্মতি প্রয়োজন, আর সে সম্মতি আনতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি। হামিদ প্রিন্সিপাল সাহেবের আধুনিক মানসিকতা দ্বারা প্রভাবিত হয়, এর ফলে সে পীরগিরিকে এক ধরনের অনৈতিক কাজ বলেই বিশ্বাস করে। আর তাই পিতার সঙ্গে মাদ্রাসা পরিবর্তনের আলোচনা তর্কযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। পীর সাহেবের আশা ছিল, তার একমাত্র ছেলে হামিদ পীরগিরি করবে, কিন্তু হামিদ তার পীরপ্রথা বিরোধী বিশ্বাস থেকেই বলে ওঠে— 'আমি পীরগিরি করব না বাপজান'। এমন কি পীরগিরির রোজগারকে হামিদ হালাল বলেই মনে করে না। তাই তর্কের এক পর্যায়ে হামিদের মুখ থেকে চরম সত্যটি বেরিয়ে যায়— "পীরগিরিতে আমি বিশ্বাস করি না। ওটাকে আমি না-জায়েজ বলে মনে করি। ...শুধু না-জায়েজ না শির্ক। ...কোরআন-পাকে এটা নিষিদ্ধ।"[১৮] আজীবন লালন করা পীর সাহেবের অটল বিশ্বাসে এভাবেই আঘাত হানে হামিদ। ফলে পীর সাহেব বলে ওঠেন—'তার মানে তুমি কইতে চাও, আমি না-জায়েজ রাস্তায় রোজগার করি? আমি হারামখোর?' পীর সাহেবের এ প্রশ্নের উত্তরে হামিদ তাই সহজেই বলে— 'জি হাঁ। কোরআন মানলে তা বলতেই হয়।' যে হামিদ ফতেপুরের খানদানি পীর-পরিবারের একমাত্র উত্তরসূরী, সেই হামিদের মুখ থেকে এ ধরনের কথা এবং বিশেষ করে পীরগিরিকে না-জায়েজ, হারামখোর ও কোরআন-বিরোধী বলে মন্তব্য করার মধ্য দিয়ে পীরপ্রথার পতনোন্মুখ চিত্রকেই লেখক অত্যন্ত শিল্পকুশলতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এটা মূলত পুরাতন ও নতুনের দ্বন্দ্ব। তাই স্বাভাবিক কারণেই পুরাতন বিশ্বাসের উপর নতুনের এই আঘাত পুরাতনদের পক্ষে সহ্য করার কথা নয়। ফলে পীর সাহেব তার একমাত্র উত্তরাধিকারীকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। হামিদও নতুনের প্রতিনিধি হিসেবে পুরাতনের সঙ্গে আপস না

করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় ও নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে নিউ স্কিম মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শুরু করে।

এক সময়ে বাংলাদেশে মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণরূপেই মক্তব-মাদ্রাসাকেন্দ্রিক। মুসলিম শাসনামলে শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশে অসংখ্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসকবর্গ, অভিজাত শ্রেণি ও ধনী ব্যক্তিগণ ধর্মীয় কর্তব্য ও প্রশংসনীয় কাজের অংশ হিসেবে মসজিদসংলগ্ন স্থানে অসংখ্য মক্তব-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[১৯] আর এসব মক্তব-মাদ্রাসা-খানকাহ্-দরগাহ্তেই মুসলমানেরা ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করত এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ ও খরচ চালানোর জন্য সরকার ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের থেকে লাখেরাজ, মাদাদ-ই-মাশ, বৃত্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। এসব ধর্মীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে মূলত কোরান-হাদিস-ফেকাহ্ শাস্ত্র প্রভৃতি পড়ানো হত। পরবর্তী সময়ে এই মাদ্রাসাগুলোই ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা নামে পরিচিতি লাভ করে। সতের-আঠার শতকের দিকে উত্তর ভারত থেকে আগত অভিজাত মুসলমানদের মৌখিক ভাষা উর্দু এদেশে জেঁকে বসলে আরবি-ফারসির সঙ্গে উর্দুও মাদ্রাসার একটি প্রধান ভাষা হিসেবে স্থান করে নেয়।[২০] ব্রিটিশ শাসনামলে এসে মুসলমানরা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে ইংরেজি তথা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। ১৮৩৭ সনে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি রাজভাষা হলে হিন্দুরা তাকে স্বাগত জানালেও মুসলমানেরা পুরাতন পদ্ধতিতেই শিক্ষাগ্রহণ করতে থাকে। উনিশ শতকের বিভিন্ন সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সময়োপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা কার্যকর হয়নি।[২১] ১৮৯৯ সনে সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) মাদ্রাসা শিক্ষাকে তুলে দিয়ে আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী (স্কুল-কলেজ) প্রবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তবে তা সম্ভব না হলেও অবশেষে ১৯০৮ সনে বাংলাদেশে ওল্ড স্কিম মাদ্রাসার পাশাপাশি নিউ স্কিম মাদ্রাসার প্রবর্তন হয়—

> বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলিতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়াবার ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু বাংলা ছাড়া অন্যান্য বিষয় উর্দু মাধ্যমে পড়ান হত, পরীক্ষার খাতায় উর্দুতে লিখতে হত। ইংরাজী-বাংলা শিক্ষার সঙ্গে গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের জন্য আবদুল করিম ও আবু নসর ওহীদ যত্নবান হন। আবু নসর ওহীদ মধ্যপ্রাচ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে ধর্মের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সামঞ্জস্য রেখে 'নিউ মাদ্রাসা স্কীম' শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেছিলেন। তার এই প্রচেষ্টার মধ্যে সরকারের সহযোগিতা ছিল। আধুনিক শিক্ষানুরাগীরা এভাবেই প্রতিক্রিয়াশীলদের মোহ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলেছিলেন।[২২]

বিশ শতকের মধ্যভাগে মুসলমানদের মাদ্রাসা শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে চরম মতদ্বৈততা ছিল। ১৯৪০ সনে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় 'বাঙ্গালার ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার অবস্থা' নামক সম্পাদকীয়তে বলা হয়— "যে সমস্ত কারণবশতঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্পদ ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বঙ্গবাসী মুসলিম সমাজের অধঃপতন ঘটেছে, ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সমাজ ও সরকারের উদাসীনতাকে তন্মধ্যে প্রধান কারণ বলে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে।"[২৩] উক্ত সম্পাদকীয়তে ওল্ড স্কিম মাদ্রাসার দোষ-ক্রটি উল্লেখ করে তাকে আধুনিক করার জোর দাবি তোলা হয়। কিছু

পত্রিকা উভয় পদ্ধতির শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সমর্থন করে।[২৪] তবে অধিকাংশ পত্রিকাই নিউ স্কিম মাদ্রাসার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। তবে 'শরীয়তে এসলাম' নামক পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়— "বিশুদ্ধ পদ্ধতির ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার আবশ্যকতা বিশেষ করিয়া বাঙ্গালায় খুব বেশী; ইহার অভাবে আজ অধিকাংশ অধুনা মওলবী সাহেবগণ দ্বীনিয়াত্, এসলামী শিক্ষা ও জাতীয়তা হইতে বহু দূরে পতিত হইতেছে।"[২৫] 'বুলবুল', 'সওগাত', 'মাসিক মোহাম্মদী', 'শিখা', 'মোয়াজ্জিন', 'ছোলতান' প্রভৃতি পত্রিকা নিউ স্কিম মাদ্রাসার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। এসব পত্রিকার মাধ্যমে মোজাফফর আহমদ, খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ, খান বাহাদুর নাসিরুদ্দীন আহমদ, মওলানা আকরম খাঁ, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, মুহম্মদ আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন, মোহম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রমুখ[২৬] নিউ স্কিম মাদ্রাসার মাধ্যমে মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে শক্ত অবস্থান নেন। ১৯৩১ সনে 'শিখা' পত্রিকার একটি নিবন্ধে আবদুল হক চৌধুরী এক পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন—

> দেখা যাইতেছে, মাদ্রাসা-শিক্ষার সাহায্যভিন্ন মুসলমান শিক্ষার পথে আসিতে চায় না। এই জন্যই ১৯১৪ সালে মাদ্রাসা শিক্ষাকে বহু পরিমাণে Secular করিয়া Reformed Madrasha Scheme প্রবর্তিত হয়। Reformed Madrasha Scheme-এর ফলে মাদ্রাসা বহু পরিমাণে Secular ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। ইদানীং Dacca Board মাদ্রাসা Course-কে আরও Secular করিয়াছেন। এই Scheme মুসলমানকে অনেকটা সাধারণ শিক্ষার দিকে টানিয়া আনিতেছে। বর্ত্তমানে ৬৩৬টি Reformed Madrasha আছে। কিন্তু এখনও বাঙ্গলা জুড়িয়া বহু Old Scheme Madrasha রহিয়াছে। গত ১৯৩০ সালের লিস্টে দেখা যায় যে, গভর্ণমেন্টের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াও এখন বাঙ্গলায় ২০৮টি Old Scheme মাদ্রাসা রহিয়াছে। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি মুসলমানের এই বিপুল আগ্রহ ইহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া আমাদিগকে শিক্ষার পানে অগ্রসর হইতে হইবে।[২৭]

এভাবে বিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশের মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণের পক্ষে-বিপক্ষে যে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, লেখক এ উপন্যাসে সেই ইতিহাসটিও আমাদের জানিয়েছেন। অত্যন্ত সচেতনভাবেই লেখক নতুন-পুরাতনের দ্বন্দ্বটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। একদিকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানবিরোধী গোঁড়া রক্ষণশীল ধর্মাশ্রয়ী শ্রেণি এবং অন্যদিকে ধর্মকে আধুনিক ব্যাখ্যা, প্রগতিশীল মানসিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাস্তবতা ও যুক্তির আলোকে সবকিছুকে বিচার করার প্রয়াসী আধুনিক শ্রেণি— এই দুই শ্রেণির দ্বন্দ্ব-সংঘাতকেই লেখক তাঁর উপন্যাসে শিল্পরূপ দিয়েছেন। এখানে ফতেপুরের পীর সাহেব ও তার মুরিদ-মোতেকাদ-অনুসারীরা প্রথম শ্রেণির এবং সিরাজগঞ্জের মাদ্রাসা-কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেব ও হামিদ পরবর্তী শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করছে। লেখক যেন প্রিন্সিপাল সাহেবের মুখ থেকে ওল্ডস্কিম-নিউস্কিম মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে আধুনিকতার সেই মহান বাণীই উচ্চারণ করেছেন, আর সেই সাথে উন্মোচিত হয়েছে তথাকথিত ধর্মশিক্ষার নামে অজ্ঞানতার স্বরূপ। হামিদের কিশোর মনে তার প্রতিক্রিয়া নিম্নরূপ :

প্রথমত প্রিন্সিপাল সাহেব বলিয়াছেন : পুরাতন নেসাব সত্যই পুরাতন। বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে এবং বাস্তব জীবনের সাথে এ শিক্ষার কোনও সম্পর্ক নাই। কাজেই মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করিয়াও মানুষ বর্তমানে দুনিয়ার বিচারে মূর্খ থাকিয়া যায়। দ্বিতীয়ত তিনি বলিয়াছেন : ওই শিক্ষার ফলে মানুষ অনুদার সংকীর্ণমনা হয়। নিজের মতের বাইরের সকলকেই তারা ভ্রান্ত মনে করে। এই জন্যই এঁরা খোদ মুসলমানদের মধ্যেও এত-এত মযহাব ও ফেরকাবন্দির আমদানি করিয়াছেন। তৃতীয়ত প্রিন্সিপাল সাহেব বলিয়াছেন : এই শিক্ষা আলেমদেরে এবং তাঁদের প্রভাবে গোটা মুসলমান জাতিকে ধর্মের রুহের বদলে তার জেসেমে, শাঁসের বদলে খোলসে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। ফলে এরা ইমান ও আমলে-সালেহার বদলে বাহ্য অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া-কর্মকেই ধর্মের সবটুকু মনে করিয়া থাকে। ... মযহাবি মতভেদ সব ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে বটে, কিন্তু মুসলমানদের মত উগ্র মতভেদ আর কোথাও নাই। প্রিন্সিপাল সাহেব বলিয়াছেন : পুরাতন নেসাবের শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেমদের কর্ম-ক্ষেত্র নাই বলিলেই চলে। এক কাযীগিরি ও আরবি-ফারসি মাস্টারি। ফলে কাজের অভাবে এরা মযহাবি কলহ লাগাইয়া বেড়ায়।[২৮]

অন্যদিকে পীর সাহেবের উক্তির মাধ্যমে লেখক ব্যক্ত করেছেন তথাকথিত ধর্ম-শিক্ষার ধ্বজাধারী ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়া। হামিদ নিউ স্কিম মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার কথা বললে পীর সাহেবের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে সে কথা। হামিদ যখন ওল্ড স্কিম মাদ্রাসার শিক্ষায় জ্ঞান-লাভের সীমাবদ্ধতার কথা তুলে বলে— "পুরাতন নেসাবে জ্ঞান লাভ হয় না। জ্ঞানের বদলে সেখানে শিক্ষা দেওয়া হয় অজ্ঞান। চোখ বুইজা কেমনে সুরুজের আলোক অস্বীকার করা যায়, মাদ্রাসায় তাই শিখানো হয়। ...স্কুল-কলেজের ছাত্ররা যে জ্ঞান পায় আমরা তা পাই না। ওদেরে জ্ঞান-বিজ্ঞান ভূগোল খগোল পড়ান হয়, আমাদেরে তা পড়ান হয় না;"[২৯] তখন পীর সাহেব বলেন— "স্কুল কলেজ ও মকতব মাদ্রাসায় দুই রকম শিক্ষা ত হৈবই। স্কুল-কলেজে শুধু দুনিয়াবি শিক্ষা দেওয়া হয়। আর মাদ্রাসায় শিখানো হয় ধর্ম-ইমানের কথা, আখেরাতের কথা। স্কুল-কলেজে পড়ে মানুষ চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চুরামি-ধাউরামি কৈরা টাকা রোজগারের জন্য।"[৩০] এ বক্তব্য শুধু পীর সাহেবেরই নয়, বরং এর মাধ্যমে লেখক আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে তৎকালীন মুসলমান-সমাজের রক্ষণশীল অংশের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। এরূপ একটি উদাহরণ পাই সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীতে। ছেলেবেলায় তিনি ইংরেজি পড়ার ইচ্ছা পোষণ করলে সে-সম্পর্কে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মনোভাব ছিল পীর সাহেবের মতোই। মীর মশাররফ হোসেন তাঁর *আমার জীবনী* গ্রন্থে বলেছেন—

আত্মীয় স্বজন গুরুজনদের ধারণা ও বিশ্বাস যে ইংরেজি পড়িলেই একরূপ ছোটখাট শয়তান হয়, দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে। সরাব খায়, জাবহা ঝট্‌কার বিচার নাই। হালাল হারামে প্রভেদ নাই। পাক নাপাকে প্রভেদ থাকে না। মাথার চুল খাঁট করিয়া নানাভাবে ছাঁটে, সাহেবী পোষাক পরে। ছুরি কাটায় খানা খায়। নামাজ রোজায় ভক্তি করে না। আদব তমিজের ধার ধারে না। স্বভাবও যেন একটু উদ্ধত ভাব ধারণ করে। নম্রতার নাম-গন্ধ থাকে না। ... মাতামহীর ধারণা ছেলে খৃষ্টান হইয়া মেম বিয়ে করিবে। মরিবার সময় ইংরেজী কথা বলিয়া মরিবে। খোদা রসুলের নাম করিবে না। মোসলমান ধর্ম প্রতি বিশ্বাস থাকিবে না।[৩১]

বিশ শতকের প্রথমদিকে এসে মুসলমানেরা ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি তথা আধুনিক শিক্ষার দিকে ধাবিত হলেও সমাজের একটা বড়ো অংশ তখনো প্রাচীনপন্থী শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তবে তার ক্ষয়িষ্ণু রূপটিও ধরা পড়ে। আবুল মনসুর আহমদ অত্যন্ত সুকৌশলে তাঁর *আবেহায়াত* উপন্যাসে ওল্ডস্কিম-নিউস্কিম মাদ্রাসায় শিক্ষাদানের পার্থক্যের বর্ণনার মাধ্যমে সেই গোঁড়া-রক্ষণশীল-প্রাচীনপন্থী-প্রগতিবিরোধী-অবৈজ্ঞানিক শিক্ষার স্বরূপ উন্মোচন করে মুসলমান-সমাজের পশ্চাৎপদতার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। কীভাবে মুসলমান সমাজের তরুণ শিক্ষার্থীরা মুসলমানদের পশ্চাৎপদ মানসিকতার মায়াজাল ছিন্ন করে আধুনিকতার পথে পা বাড়িয়েছে, পীর-পরিবারের সন্তান হামিদ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হামিদ তার পিতার সঙ্গে আপস করেনি বরং বিদ্রোহ করে বেরিয়ে গেছে আলোর জগতে। আর এই পথ ধরেই এসেছে বিশ শতকের মধ্যভাগে মুসলমান সমাজের জাগরণ। ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সচেতনভাবেই এ উপন্যাসের মাধ্যমে মুসলমান সমাজের ভেতরগত মানসিক দ্বন্দ্বের চিত্র তুলে ধরে তা থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন।

আবেহায়াত উপন্যাসে লেখক শিক্ষা-পদ্ধতি তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায় ভাগ করে প্রতিটি পর্যায়ের ভেতরগত চিত্র তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে ওল্ড স্কিম ও নিউ স্কিম মাদ্রাসা সম্পর্কে সিরাজগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষের বক্তব্যে তৎকালীন শিক্ষা-পদ্ধতির একটা বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে। অধ্যক্ষ মহোদয়ের মতে— "পুরনো পদ্ধতি সত্যি পুরনো; বর্তমান যুগের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ও দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে পুরনো পদ্ধতির শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই। ওল্ড স্কিম মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ সমাপ্ত করেও একদল শিক্ষিত মানুষ বাস্তব জগতে মূর্খ থেকে যায়, প্রাচীনপন্থী মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণের ফলে মানুষ তাই অনুদার ও সংকীর্ণমনা হয় এবং নিজের মতের বিরোধী অন্যদের তারা ভ্রান্ত মনে করে।"[৩২] অন্যদিকে পীর সাহেব মনে করেন— ওল্ড স্কিম মাদ্রাসাতেই ভালো শিক্ষা দেয়া হয়, আর নিউ স্কিমে আসলে মাদ্রাসার নামে ইংরেজি শিক্ষা দেয়া হয় এবং মুসলমানদের ধর্মহীন করার উদ্দেশ্যেই নিউ স্কিম মাদ্রাসার সৃষ্টি। লেখক তাঁর ব্যক্তিজীবনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিলিয়ে এই উপন্যাসে বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন।

হামিদ তার উকিল ভগিনীপতির সহযোগিতায় সিরাজগঞ্জ নিউ স্কিম মাদ্রাসায় ভর্তি হয় এবং তার পরেই শুরু হয় তার নতুন জীবন। তার মানসিকতা পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে পরিবর্তিত হয় তার পোশাক-পরিচ্ছদও। "কল্লিদার কোর্তা, চুড়িদার পাজামা পাঁচ কলি টুপির বদলে এখন সে ধরিয়াছে শেরওয়ানি আলিগড়ী পাজামা ও জিন্না ক্যাপ। শেরওয়ানির বদলে কোটও পরে মাঝে মাঝে। নফল নামাজ ও রাত্রির এবাদত সে ছাড়িয়া দিয়াছে।"[৩৩] এ অবস্থায় হামিদ মেধা তালিকায় দশ জনের মধ্যে স্থান নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করে এবং নিউ মাদ্রাসার পরিবর্তে ভর্তি হয় কলেজে। আর তাও আই.এ.তে নয় আই.এসসি.তে। বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ার ব্যাপারেও সে মানসিক দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে সঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে পেরেছে। আর এ বিষয়ে তাকে সহযোগিতা করেছেন প্রিন্সিপাল সাহেব। তাঁর বক্তব্য— "সৃষ্টি রহস্যের তলদেশে ডুব দিয়া আবেহায়াতের সন্ধান করা যায় শুধু বিজ্ঞানের সাহায্যেই।

ফিজিক্স্, কেমেস্ট্রি, বায়োলজি, জিওলজি, এস্ট্রনমি যখন পড়বে, তখন দেখবে সৃষ্টির কি অপূর্ব কৌশল, সৃষ্টি-কর্তার কি বিচিত্র মহিমা। সে রহস্যে সে মহিমায় যত ডুব দিবা তত দেখবা সে বৈচিত্র্যের যেন শেষ নাই, সে মহিমার যেন সীমা নাই, সে তলদেশের যেন তলা নাই। আরও বিচিত্র। আরও মহিমাময়। আরও গভীর।"[৩৪] এ বক্তব্যের পর হামিদের আই.এস.সি.তে পড়া নিয়ে আর কোনো দ্বিধা থাকে না। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর হামিদের মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটে। যে হামিদ আবেহায়াতের পানি ও খাজে-খেজেরের সাক্ষাৎ পেতে দিনরাত নামাজ-রোজা ও আজগুবি সব কাণ্ড করত, সেই হামিদ আই.এস.সি.-তে ভর্তি হয় এবং পূর্বের সবকিছুকে অবাস্তব কল্পনা করে মনে মনে হাসে। কলেজে ভর্তি হয়ে আরেক দফা তার পোশাক পরিবর্তনের সাথে মানসিক পরিবর্তনের বিষয়টিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ যেন উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের প্রাণপুরুষ ডিরোজিওর ক্ষুদ্রতম সংস্করণ—

> কলেজে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পরেই পাঞ্জাবী-পাজামা ছাড়িয়া ফুলপ্যান্ট ও হাফশার্ট ধরিয়াছে। ...এখন সে শুধু ওয়াকতিয়া নামাজই তরক করে না। জুম্মার নামাজেও সে যায় না। শুধু যে নামাজ পড়ে না, তা নয়। নামাজ-রোজাকে সে এখন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া থাকে। ...সে যেন তার অতীতকে ধুইয়া-মুছিয়া একদম নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য যিদ করিয়া লাগিয়াছে। নামাজ-রোজাকে এতদিন সে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান বলিত। এখন ও-সবকে কুসংস্কার ও কুপ্রথা বলা শুরু করিয়াছে। খোদ ধর্মকে সে আক্রমণ করিতে শুরু করিয়াছে। সে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে আচার-অনুষ্ঠান-প্রধান ধর্ম আসলে ধর্মই নয়। তেমন ধর্মে মানুষের আত্মিক ও নৈতিক উন্নতি হয় না। তার বদলে ওতে মানুষের মন হয় সংকীর্ণ, গোঁড়া। তাদের আচার-অনুষ্ঠান হয় ব্যায়াম-চর্চায় পরিণত।[৩৫]

নামাজ-রোজাকে হামিদ অতঃপর কুসংস্কার এবং কুপ্রথা বলে প্রচার শুরু করে। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে এসব নিয়ে বিতর্কও হয়। বিতর্কের সূত্র ধরে সহপাঠীরা প্রিন্সিপালের কাছে হামিদের বিরুদ্ধে নালিশও করে। প্রিন্সিপাল হামিদকে ডেকে তার কৈফিয়ত চাইলে হামিদও অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীনভাবে তার সহজ উত্তর দেয়— "আমি নামাজ রোজা বিশ্বাস করি না। ...রোজা স্বাস্থ্যনীতি বিরোধী একটি কুসংস্কার মাত্র। আর নামাজ মানুষকে সংকীর্ণমনা স্বার্থপর তোষামুদী জীবে পরিণত করে। তোষামোদের দ্বারা কারো আত্ম-মর্যাদাবোধ জাগে না, সে তোষামোদ খোদাকেই করুক, আর রাজা-বাদশাকেই করুক।"[৩৬] এ সমস্ত ঘটনার সঙ্গে *আত্মকথা*-য় বর্ণিত লেখকের জীবনের বাস্তব মিল পাওয়া যায়— "নামাজ আমিও পড়িতাম না। আলসামী করিয়া পড়িতাম না তা নয়। নামাজ পড়ার আমি বিরোধীই ছিলাম, ছাত্রবন্ধুদের মধ্যে নামাজের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতাম।"[৩৭] আবুল মনসুর আহমদের *আত্মকথা* পড়লে এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিজীবনের প্রভাব আবিষ্কার দুঃসাধ্য নয়।

পাঁচ.

আই.এসসি.তে হামিদ মেধা তালিকায় স্থান নিয়ে পাশ করে ও একশ বিশ টাকা মাসিক বৃত্তি পায়। তারপর আবার জল্পনা-কল্পনার পর ডাক্তারি পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার পরিবর্তন দিন-দিন বাড়তে থাকে। বেশি পরিবর্তন লক্ষ করা যায় মেডিকেল কলেজে পড়ার সময়।

হামিদের নাটকীয় পরিবর্তন আমরা লক্ষ করি ললিতা, রাযিয়া ও জাহানারার সঙ্গে পরিচয় এবং তৎপরবর্তী ব্যবহারে। বিশেষ করে রাযিয়ার সঙ্গে হামিদের রেসকোর্স ময়দানের ঘটনা এবং সমসাময়িক মন-মানসিকতা অত্যন্ত আধুনিকতার পরিচায়ক। যে হামিদ একসময় আবেহায়াতের পানি পান করবার জন্য দিনরাত ইবাদত বন্দেগি এবং অবাস্তব-অলৌকিক সব কাণ্ড করত, সেই হামিদ এখন নারী প্রেমের সুধাকে পুরুষের আবেহায়াত বলে মনে করে। যে হামিদ নারীদের পর্দাহীন চলাফেরার কথা কল্পনাও করতে পারত না, সেই হামিদ এখন পর্দা-প্রথাকে ঘৃণা করে। রাযিয়া-হামিদের প্রেম ষড়যন্ত্রের কারণে ভেঙে যায়। আশরাফবেশে জাহানারার অভিনয় এবং রাযিয়ার সঙ্গে দৈহিক মিলনের মিথ্যা ঘটনাকে কেন্দ্র করে হামিদের মনের বাঁক পরিবর্তিত হলেও বিদেশ থেকে উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ফেরার পরে তার পাশ্চাত্য প্রভাবিত মন-মানসিকতার পরিচয় আমরা পাই।

প্রথম থেকেই আমরা দেখেছি হামিদ খুবই নীতিপরায়ণ এবং আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তি। যেটাকে যুক্তি দিয়ে ভালো মনে করেছে সে সেটাই করেছে এবং এজন্য শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে নিজের আদর্শই প্রতিষ্ঠা করেছে। সে পিতার পীর-ব্যবসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং নিজেই পৈতৃক পীর-ব্যবসার ইতি টেনেছে। ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা থেকে নিউ স্কিম মাদ্রাসায় পড়তে পিতার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, বিলেত ফেরৎ ডাক্তার হিসেবে মেডিকেল কলেজে চাকরির সময় ডাক্তারি পেশার খারাপ দিকগুলোর বিরুদ্ধে সহকর্মী তথা প্রিন্সিপালের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে চাকরিতে ইস্তফা পর্যন্ত দিয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা হামিদকে *জীবন-ক্ষুধা* উপন্যাসের নায়ক হালিমের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। *জীবন-ক্ষুধা* উপন্যাসে হালিম তার আদর্শিক সংগঠন কৃষক-প্রজা আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিল, কিন্তু সেই হালিমই আবার পরে পুঁজিবাদী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং সাম্প্রদায়িক সংগঠন মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিল। তাই চারিত্রিক দিক থেকে হালিমের চেয়ে হামিদই বেশি প্রতিবাদী ও আদর্শপরায়ণ।

বিলেতফেরত ডাক্তার হামিদের আরেকটি পরিচয় পাই অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা থেকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার দিকে ঝুঁকে পড়ার মধ্যে। যে হামিদ 'এসোসিয়েট প্রফেসর অব মেডিসিন এ্যান্ড সার্জারি' ও 'এম.আর.সি.পি. এফ.আর.সি.এস.' সেই হামিদের মুখে আমরা সার্জারিকে জল্লাদি বা কসাইগিরি বলতে শুনি। সে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার চেয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার অধিক কার্যকারিতা সম্পর্কে অনেক যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং অবশেষে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগীদের চিকিৎসায় কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। ডাক্তার রশিদের সাথে কথোপকথনে এ সম্পর্কে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বেরিয়ে এসেছে। "হোমিওপ্যাথি এনার্জির উপর প্রতিষ্ঠিত বৈলাই তার অত নিন্দা করা হৈতেছে। এলোপ্যাথির বুনিয়াদ স্থুল জড় পদার্থ। হোমিওপ্যাথির বুনিয়াদ সেই স্থুল জড়ের শক্তিকৃত এনার্জি। স্থুলের চেয়ে সূক্ষ্মের শক্তি কত বেশি তার প্রমাণ এটম ও হাইড্রোজেন বোমা।"[৩৮] এ কারণেই আমরা দেখি ওয়াজেদের জটিল রোগের চিকিৎসায় হামিদ টেলিপ্যাথি বা 'নেসবতে-বায়নান্নাসে'র আশ্রয় নিয়েছে, বাছুরের সকাল বেলার প্রস্রাব গরম করে বুকে লিভারের উপর সেঁক দিয়েছে এবং 'দশ

বছরের পুরনো চাউলের জাউ ভাত কাঁচা পটল পাতা ও শুকনা নালিতা পাতার সুরুয়া হরিতকি ও ছাগলের দুধ'[৩৯] রোগীর পথ্য হিসেবে ব্যবহার করেছে। এ সমস্ত চিকিৎসার ফলে ওয়াজেদের আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার হামিদেরও স্বাস্থ্যের বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে। এসব কিছুরই আবার বড়ো-বড়ো ডাক্তারি বইয়ের উদ্ধৃতির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দিয়েছে এবং অবশেষে হামিদ তার এককালীন কলেজমেট রশিদ ভাইয়ের বদান্যতায় একটা হোমিও হাসপাতাল খোলার দিকে এগিয়ে চলেছে ও লন্ডন থেকে তার অনুমোদনও পেয়েছে। ঔপন্যাসিক তাঁর শিল্পী মন দিয়ে জীবন-জিজ্ঞাসার বিকাশ ঘটিয়েছেন হামিদ চরিত্রের মাধ্যমে এবং একজন আদর্শ ডাক্তারের স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত তার বাস্তব বিবরণও তুলে ধরেছেন।

মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার পর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও আধুনিক চিন্তা-চেতনার চরম পর্যায়ে উন্নীত হলেও হামিদ দুটি ব্যাপারে তখনও রক্ষণশীলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। একটা পর্দা ও অন্যটা দাড়ি। হামিদ তার জীবনের প্রথম থেকেই কড়া পর্দাপ্রথার মধ্যে মানুষ হয়েছে। নিজ বাড়িতে শুধু মা ও বোনদের ছাড়া আর কোনো মেয়ে বা মহিলার সঙ্গে কোনোদিন সে কখনও কথা বলেনি। মাদ্রাসা ও কলেজজীবনেও সে কোনো মেয়েকে পর্দাহীন অবস্থায় দেখেনি। শুধু রাস্তা-ঘাটে ও ট্রেন-স্টিমারে মেয়েদের বেপর্দায় দেখেছে। "হামিদ জানিতে পারিয়াছে ঐ সব মেয়েরা হয় হিন্দু, নয় গরিব মুসলমান। কালে-ভদ্রে হামিদ ট্রেন-স্টিমারের প্রথম শ্রেণীর কামরায় দু-একজন বেপর্দা মুসলিম মহিলাকেও দেখিয়াছে। তাদেরে নাসারাদের অন্ধ অনুসারী বলিয়া ঘৃণা করিয়াছে। ফলে হামিদের পর্দা সম্পর্কে মোটামুটি এই ধারণা হইয়াছে যে পর্দাটা শরাফতের লক্ষণ।"[৪০] মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা ও তাদের সম্পর্কে অস্পষ্ট বা অপরিষ্কার ধারণায় ফাটল ধরে মেডিকেল কলেজে পড়ার সময়। প্রথমদিকে হামিদের প্রাচীনপন্থী গোঁড়া ধারণায় 'নারী জাতি শয়তানের ঘোড়া', 'এরা মায়াবিনী কুহকিনী', 'নারী জাতিকে বিশ্বাস করিও না', 'বেপর্দা হিন্দু মেয়েদের মধ্যে সতী দুচারজন থাকিতে পারে, কিন্তু বেপর্দা মুসলমান মেয়েদের মধ্যে একজনও নাই' ইত্যাদি বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল। এসবের মূলে ছিল তার এক ধরনের নারী-ভীতি। ললিতার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতার সুযোগেই হামিদের মনে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তার মনের ভেতরে জড়তা কেটে যেতে থাকে এবং নারী সম্পর্কে তার মনের সব ভ্রান্ত ধারণা ও গোঁড়ামিও দূর হতে থাকে। "যে নারীর দর্শন এড়াইবার জন্য দৌড়িয়া দূরে পলাইত, সেই নারীকে দেখিবার আশায় তার পিছে পিছে ধাওয়া করে।"[৪১]

হামিদের এই মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত হয় তার রুমমেট রশিদ ভাইয়ের নারী-মন সম্পর্কিত অতি বাস্তববাদী তত্ত্ব। হামিদের প্রতি রাযিয়ার ব্যবহারের মানে করে সে অন্যরকম। নারীকে ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে অভ্যস্ত রশিদ তাই বলে— "নারী কখনো প্রেমে পড়ে না। অন্তর বৈলা তাদের কোন বস্তু নাই। তারা দেহ-সর্বস্ব। ...নারীরে দেহ দিও, মন দিও না।"[৪২] রশিদের এ-সমস্ত কথায় বিশ্বাস না করলেও মনের ওপর তার একটা প্রভাব পড়ে। তাই সে রাযিয়াকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পেতে চায়। *আবেহায়াত* উপন্যাসে আবুল মনসুর আহমদ এভাবেই নায়ক হামিদের নারীসম্পর্কিত মনোভাবের ক্রমবিকাশ দেখিয়েছেন। গোঁড়া রক্ষণশীল পরিবেশ থেকে বেরিয়ে নারীও যেমন

আধুনিকতার পথে পা বাড়িয়েছে, তেমনি নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্রমবিবর্তনও হয়েছে তার সঙ্গে। তাই হামিদের দৃষ্টিতে তার প্রেমিকা রাযিয়ার সঙ্গে আশরাফের অবৈধ সম্পর্ক তেমন দোষের নয়। সে-কারণে রাযিয়াকে পাওয়ার জন্য সে অস্থির হয়ে ওঠে। তার এই মানসিক পরিবর্তনের মধ্যে একটা অসংগতিও ধরা পড়ে। কেননা যে ব্যক্তি তার চোখের সামনে প্রেমিকার সঙ্গে অন্য পুরুষের মিলন দেখতে পায়, সে ব্যক্তি শত পরিবর্তনের মুখেও এই অবৈধ কাজকে কোনো আধুনিকতা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে না। তারপরও নারী সম্পর্কে একজন গোঁড়া-রক্ষণশীল মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তরের যে ক্রমবিকাশ লেখক হামিদের মাধ্যমে দেখিয়েছেন, তা প্রশংসার দাবি রাখে। এক্ষেত্রে আবুল মনসুর আহমদ একজন সার্থক শিল্পী। তিনি তাঁর জীবনের প্রথমদিকে পর্দা-প্রথার অনুরাগী এবং পরে পর্দার ঘোর বিরোধী ছিলেন। উপন্যাসের নায়ক হামিদের মধ্যেও অনুরূপ মনোভাব লক্ষণীয় : "হামিদের পিতা রক্ষণশীলতার প্রতীক; হামিদ প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রতীক। নবীন ও প্রাচীন চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার দ্বন্দ্ব উপন্যাসের প্রথমার্ধে চিত্রিত। যে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে হামিদ লালিত হয় সেখানে নারী পুরুষের মধ্যে সহজ মেলামেশার সুযোগ পায়নি সে।"[৪৩] অবশ্য পরে এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে।

ছয়.

উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে আমরা একটা বিষয়ে মিল খুঁজে পাই, সেটা হচ্ছে ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বীকৃতি। হামিদ, রশিদ, রাযিয়া, জাহানারা প্রত্যেকেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা তথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বলে বলীয়ান। হামিদ শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন করেছে নিজের পিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং অবশেষে বোন-দুলাভাইয়ের টাকা নিয়ে পড়েছে কিন্তু আপস করেনি। রশিদ চরিত্রে আমরা লক্ষ করি, সে সাতবছর ধরে মেডিকেলে পড়ছে ও তিন বছর ধরেই ফিফ্‌থ ইয়ারের ছাত্র কিন্তু পরীক্ষা পাশের জন্য শিক্ষকদের কাছে ধরনা দেয়নি। "নারী শিক্ষার দ্রুত বিকাশও এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অভিভাবকেরা মেয়েদের শিক্ষাদানে উৎসাহী হয়েছেন, শুধু তাই নয়, মেয়েরাও নিজেদের অধিকার ও ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার এই স্বীকৃতি নর-নারীর প্রেমের ক্ষেত্রেই শুধু প্রকাশিত হয়েছে, তাও নয়। তা ক্রমান্বয়ে পরিব্যাপ্ত হয়েছে নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাধীনতাতে।"[৪৪] ছোট স্ত্রীর প্রতি পীর সাহেবের ব্যবহার এবং তৎপরবর্তী অবস্থায় হামিদ কর্তৃক ছোট মাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা নারী অধিকারের প্রতি সচেতনতার প্রকাশ। এসবই লেখকের নিজস্ব জীবনচেতনা ও সমাজবোধ থেকে উৎসারিত।

উপন্যাসের প্রথমে আমরা পীরকেন্দ্রিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজের একটা পরিচয় পাই। এই পীর-ব্যবসা পরিচালিত হয়েছে ধর্মভিত্তিক শোষণ ও ধর্মের বহুবিধ ব্যবহারের মাধ্যমে। হামিদের পিতা সৈয়দ আব্দুল আউয়াল সামন্তপ্রভু। উপন্যাসের নায়ক পীরজাদা সৈয়দ আব্দুল হামিদও প্রথমে একই দৃষ্টিকোণ থেকে তার জীবন-প্রণালী শুরু করেছে এবং অল্পবয়সেই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে চেয়েছে। তবে তার মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতা ও মানসিকতার স্বচ্ছতা ছিল, পীর-পিতার মতো বা প্রথাগত পীরদের মতো তার মধ্যে

কোনো প্রকার ভণ্ডামি ছিল না। নিজের কাছে যেটা সঠিক বলে মনে হয়েছে সেটাই সে করতে চেয়েছে। আর এই পথ ধরেই আধুনিকতার দিকে ধাবিত হয়েছে। প্রথমে আবেহায়াতের পানি পান করার আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হলেও ছোট একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে তার জীবনের মোড় পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে পীরপ্রথা তথা সমস্ত ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে বাড়ির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে পেরেছে। ক্রমাগত প্রগতিশীল মানসিকতার অধিকারী হয়ে এক সময় বিলেতফেরত ডাক্তার হয়ে এসেছে। গরিব জনগণের সেবা করার জন্য নারায়ণগঞ্জে ক্লিনিক তৈরি করেছে এবং পরে আমরা আবার দেখতে পাই রাযিয়াকে লাভের জন্য আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় নিয়েছে। "এভাবে তার জীবনে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তাতে একে করা হয়, তেমনি বাল্যবিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ ব্যাহত হয়। হিন্দু-সমাজের পাশাপাশি মুসলমান-সমাজেও বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ প্রথা বিদ্য সামন্তবাদী জীবন থেকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জীবনে প্রত্যাবর্তন বলে তার শ্রেণী চরিত্র নির্দেশ করা যায়। 'জীবন-ক্ষুধা' উপন্যাসের সঙ্গে এই মিল মৌলিক।"[৪৫] ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিজীবন পর্যালোচনা করলেও আমরা দেখতে পাই যে, তিনি প্রথমে কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজা সমিতির আন্দোলন করলেও পরে মুসলিম লীগে যোগদান এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন। এখানে আমরা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় পাই।

আবেহায়াত উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক নায়ক হামিদের জীবনের ক্রমবিকাশ দেখাতে গিয়ে সমাজের কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ আমাদের সমাজে একটা দুষ্টক্ষতের মতো আশ্রয় করেছিল। বহুবিবাহের মাধ্যমে যেমন নারীর প্রতি পুরুষের আগ্রাসী মনোভাব ও নারীকে পণ্য হিসাবে বিবেচনা মান ছিল। *আবেহায়াত* উপন্যাসে ফতেপুরের পীর সাহেবের মধ্যে এই দুটি বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। শরিয়তের দোহাই দিয়ে তিনি চারটি বিয়ে করেছেন। কোনো পুত্রসন্তান না হওয়ায় তিনি বড়ো বিবিকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তার শূন্যস্থানে আর একটি বিয়ে করতে চেয়েছেন। ত্রিশ বছরের বিবাহিত স্ত্রী, যার আবার মেয়ে-মেয়ের জামাই-নাতিনাতনি রয়েছে, তাকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পীর সাহেবের মন দ্বিধান্বিত হয়নি। অন্যদিকে পীর সাহেব যখন ছোট বিবিকে বিয়ে করেন, তখন ছোটবিবির বয়স ছিল মাত্র তেরো বছর এবং সে কারণে বিয়ের তিন বছরের মধ্যে পরপর দুটি সন্তান হয়ে মারা যায়। এই পীর সাহেবই আবার শেষ বয়সে সতেরো বছরের এক মেয়েকে বিয়ে করেন—

> শুধুমাত্র ফতেপুর খান্দানের সিলসিলা রক্ষার জন্য এক গরীব ভদ্রলোকের সতর বছর বয়সের এক মেয়েকে শাদি করলেন। আল্লার ফযলে পীর সাহেব কেবলার কুওত কোনও যুবকের চেয়ে কম নয়। আল্লার মর্জিতেই বছর ঘুরিবার আগেই তিনি একটি মৃত পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া মরণাপন্ন কাহিল হইয়া পড়িলেন। আর ভাল হইল না। সূতিকা রোগে চিররুগ্ন হইলেন। তার উপর কয়েক মাসের মধ্যে আবার হামেলা হইয়া অকাল-প্রসব-বেদনায় এক্লেমশিয়ায় সেই যে বেহুশ হইলেন আর হুশ হইলেন না।[৪৬]

এভাবে বাল্যবিবাহের ফলে অকালে মারা যাওয়া নারীর সংখ্যা তৎকালীন সমাজের একটা সাধারণ চিত্র। পীর সাহেবের মতো লোকেরা নারীদের শুধু ভোগের বস্তু ও সন্তান

উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। মেডিকেল কলেজের ছাত্রী রাযিয়ারও বাল্যবিবাহ হয়েছিল এবং তাদেরও দাম্পত্যজীবন সুখের হয়নি। ওয়াজেদ তার স্ত্রী রাযিয়াকে তালাক না দিয়ে তার সম্ভাবনাময় জীবনকে ধ্বংস করেছে, আর অন্যদিকে ওয়াজেদ আর একটি বিয়ে করেছে। মাত্র এগারো বছর বয়সের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী রাযিয়ার এই বাল্যবিবাহের করুণ পরিণতির শিকার হয়েছে হামিদ। মেডিকেল কলেজের ছাত্র রশিদেরও বিয়ে হয়েছিল মাত্র ষোলো বছর বয়সে তারই চাচাতো বোনের সঙ্গে। তখন চাচাতো বোনের বয়স ছিল সাত বছর, সে বিয়েও টেকেনি। তাই রশিদ পরিণত বয়সে বিয়ে না করে যথেচ্ছভাবে অন্য নারী সম্ভোগ করেছে। আবুল মনসুর আহমদ উপন্যাসের মূল কাহিনীর পরিপূরক হিসেবে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের যে চিত্র উপস্থাপন করেছেন তা মুসলমান-সমাজের অধোগতির চিত্র। অবশ্য লেখক ব্যক্তিজীবনেও ২৮ বছর বয়সে ১০ বছরের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, তবে তাঁর দাম্পত্যজীবন সুখের হয়েছিল বলে তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায়।[৪৭]

আবেহায়াত উপন্যাসটি ১৯৬৮ সনে প্রকাশিত হলেও এখানে বিশ শতকের মধ্যভাগের বা নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে তৃতীয় দশকের বাঙালি মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

> 'জীবন ক্ষুধা' উপন্যাসে ভূমিভিত্তিক সামন্ততন্ত্রের যে পতনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তারই ভিন্ন রূপ ফুটে উঠেছে 'আবেহায়াত' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে এই বোধ পরিমূর্তিত হয়েছে ধর্মভিত্তিক শোষণকে কেন্দ্র করে– যার মূল চারিত্র লক্ষণ সামন্ততান্ত্রিক। উপন্যাসের পরিণতিও এই চিন্তাধারার পরিপূরক। উভয় উপন্যাসের ভেতর পার্থক্য পদ্ধতিগত, মূল্যবোধগত নয়। আবুল মনসুর আহমদ প্রথম উপন্যাসে তৎকালীন রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনাকে উপজীব্য করেছেন, পরের উপন্যাসে সামাজিক সমস্যাকে প্রায় একই দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন।[৪৮]

এই সমাজ-ইতিহাসের আদলে এ-উপন্যাসে মূলত বাঙালি মুসলমানের ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার, পীর-ব্যবসার স্বরূপ এবং শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ওল্ড স্কিম-নিউ স্কিম কলেজের দ্বন্দ্ব, পর্দাপ্রথা, ডাক্তারি পেশার বাস্তব চিত্র ও তাদের স্বার্থপর হীন মনোবৃত্তির সঙ্গে নায়ক হামিদের নৈতিক টানাপড়েন ও মনোবিকাশের বিভিন্ন পর্যায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। "সমাজ দেহের বিষাক্ত ব্যাধি কিভাবে সমাজের মানুষগুলোকে পঙ্গু করে দিয়েছে সেই ইতিহাস আবেহায়াতের লেখক আমাদের কাছে কৌশলে তুলে ধরেছেন। শুধু তুলে ধরেই ক্ষান্ত হননি তির্যক বাক্যবাণেও জর্জরিত করেছেন।"[৪৯] উপন্যাসে লেখক বেশ কিছু খণ্ড-খণ্ড উপকাহিনীরও সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য এগুলো মূল কাহিনীর সঙ্গে তেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও পড়তে খারাপ লাগে না। তবে মাঝে-মাঝে একটা বিষয় বোঝাতে গিয়ে লেখক অতিরিক্ত তাত্ত্বিক আলোচনার অবতারণা করেছেন, যাতে উপন্যাসের রস কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েছে। "*আবেহায়াতে*র লেখকের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে শ্রদ্ধা না জেগে পারে না, কিন্তু তত্ত্বালোচনার আধিক্য লেখকের অসংযম বা আতিশয্য বলেও প্রমাণ করে। উপন্যাসের রসবোধে এটা বিঘ্ন সৃষ্টির কারণ।"[৫০]

ঔপন্যাসিক নায়ক হামিদ চরিত্রের মনোবিকাশের একটি ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে বাঙালি মুসলমান সমাজ-জীবনের একটা ধর্মীয় চিত্র তুলে ধরেছেন — যা লেখকের ব্যক্তিগত জীবন ও পারিপার্শ্বিক সমাজেরই বাস্তব প্রতিফলন। "লেখামাত্রেই এক ধরনের আত্মচরিত — বিশেষ করে উপন্যাস ও ছোটগল্প তো বটেই। লেখক নিজে যা জেনেছেন, দেখেছেন, বিশ্বাস করেছেন ভাল বা মন্দ বলে বিচার করেছেন — ঘুরে ঘুরে তাই চলে লেখায়। সজাগ হয়ে আটকালেও অজান্তে লেখায় এসবের ছাপ পড়ে যায়।"[৫১] আবুল মনসুর আহমদের *আত্মকথা* গ্রন্থটি বিশেষ করে এর 'ধর্মজীবন' অংশটি পড়লে আমরা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারি। লেখকের নিজস্ব জীবনচেতনা ও সমাজবোধ থেকে মানবসমাজের কুৎসিত দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করে ধর্মীয় গোঁড়ামির বীভৎসতার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে হামিদ চরিত্রের মাধ্যমে এ উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। "কিছু গৌণ সাহিত্যাঙ্গ আছে, তাদের আকার এবং স্বাদে থাকে কতক বিশিষ্টতা। যেমন ভ্রমণ, আত্মজীবনী, চিঠি, ডায়েরি। ...ভ্রমণ আর উপন্যাস মিলে তৈরি হতে পারে ভ্রমণোপন্যাস তেমনি পত্রোপন্যাস, আত্মজীনীমূলক উপন্যাস, ডায়েরি-ধর্মী উপন্যাস প্রভৃতি। ...এই চারটি সাহিত্যাঙ্গই গদ্যরচনা এবং ব্যক্তিবিশেষের মনের অভিজ্ঞতার বস্তু।"[৫২] *আবেহায়াত* উপন্যাসকে সে অর্থে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলা যায়। অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসনের শেষভাগে মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান সমাজ আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে যেভাবে তাদের বহু বছরের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় বন্ধন থেকে ক্রমে মুক্ত হচ্ছিল এবং ধীরে ধীরে আধুনিক সমাজব্যবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছিল, *আবেহায়াত* উপন্যাস তার একটি সামাজিক দলিল হিসেবে বিবেচ্য। পশ্চাৎপদ শিক্ষাব্যবস্থা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ, ধর্মের আবরণে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাচেতনা ও প্রথাগত বিশ্বাসের প্রতীকী চরিত্র পীর সাহেবের সমাধিতে গিয়ে পুত্র হামিদের অনুভূতি— "চারিদিকে নীরব নিথর নিস্তব্ধতার মধ্যে তার মনে হইল এ কবর পুরাতনের সমাধি। যা কিছু প্রাচীন, যা কিছু জরাজীর্ণ সব কিছু বাবার সাথে ঐখানে সমাহিত।"[৫৩] বিশ শতকের প্রথমভাগে মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান সমাজ এভাবেই হাজার বছরের ঘুণে ধরা পুরাতন চিন্তাচেতনাকে কবর দিয়ে আধুনিক চিন্তাচেতনার ক্রমবিকাশ ঘটিয়েছে, যার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে আবুল মনসুর আহমদের *আবেহায়াত* উপন্যাসে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. সারোয়ার জাহান, *বাংলা উপন্যাস: সেকাল-একাল*, ১৯৯১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১
২. আবুল মনসুর আহমদের *সত্য-মিথ্যা* উপন্যাসের উৎসর্গপত্র, সপ্তম মুদ্রণ, ১৯৯৫, আহমদ পাবলিশিং, হাউস, ঢাকা
৩. প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৬৮; প্রকাশক মহীউদ্দিন আমদ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪৪; দাম দশ টাকা, সূত্র: নুরুল আমিন, *আবুল মনসুর আহমদ* (জীবনী গ্রন্থমালা), প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৮০
৪. ভূঁইয়া ইকবাল, *বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচিত্র* (১৯৪৭–১৯৭১), ১৯৯১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১২০
৫. নুরুল আমিন, *আবুল মনসুর আহমদের কথাসাহিত্য*, ১৯৮৪, অগ্রণী প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, পৃ. ৭২
৬. Census of Bengal, 1872, General Statement, IB, PP. 32-33; উদ্ধৃত: গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি*, ২০০২, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃ. ১১

৭. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, *হাস্যরসিক পরশুরাম*, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ২৯
৮. আহমদ শরীফ, *বিশ শতকে বাঙালী, বিহগ দৃষ্টিতে তাদের রূপ-স্বরূপ*, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, ঈক্ষণ, ঢাকা, পৃ. ৮
৯. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)*, প্রথম প্যাপিরাস সংস্করণ, ২০০১, ঢাকা, পৃ. ১৭
১০. 'আবেহায়াত', রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, *আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৪৮০-৪৮২
১১. ঐ, পৃ. ৪৮১
১২. ঐ, পৃ. ৫১৩
১৩. আবুল মনসুর আহমদ, *আত্মকথা*, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৮৮, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃ. ১৫৫
১৪. *আবেহায়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩২
১৫. ঐ, পৃ. ৫৩২
১৬. *আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫
১৭. *আবেহায়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৪
১৮. ঐ, পৃ. ৫৫৮
১৯. এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, (১৫৭৬-১৭৫৭), দ্বিতীয় খণ্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনূদিত, ১৯৮২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২২৪)
২০. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, ১৯৮৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৪৭২
২১. ১৮২৩ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় (১৭৮০ সনে প্রতিষ্ঠিত) ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলেও ১৮২৬ সনে সীমিত আকারে তার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮২৬ সনে ঢাকায় একটা ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন সরকার কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়। তবে ১৮২৪ সনে মুর্শিদাবাদে নবাব পরিবারের জন্য একটা ইংরেজি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৪৪ সনে সরকার বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মোট ৩৬টি জেলায় ১০১টি বিদ্যালয় স্থাপন করলেও তা অধিক কার্যকর হয়নি। ১৮৫৪ সনের Education dispatch-এ মাদ্রাসা শিক্ষাকে সময়োপযোগী করার কোনো ব্যবস্থার কথা বলা হয়নি। সূত্র : ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩, বা/এ, ঢাকা, পৃ. ৪৭২-৫০১; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িপত্রে জীবন ও জনমত* (১৯৩১–১৯৪৭), ২য় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২৪
২২. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৮
২৩. 'বাঙ্গালার ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার অবস্থা' : সম্পাদকীয়, 'মাসিক মোহাম্মদী', ১৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা: ১৩৪৭, শ্রাবণ; উদ্ধৃত : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
২৪. আল ইসলাহ্ পত্রিকায় 'নিউ স্কীম ও ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা' শিরোনামের সম্পাদকীয়তে এ কথা বলা হয়। ১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা; ১৩৪০, কার্ত্তিক। উদ্ধৃত : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
২৫. 'মাদ্রাসার ভবিষ্যৎ' : সম্পাদক, 'শরীয়তে এসলাম', ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা; ১৩৪২, বৈশাখ। উদ্ধৃত : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
২৬. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িপত্রে জীবন ও জনমত*, ১ম খণ্ড (১৯৭৭, বা/এ) ও ২য় খণ্ডের (২০০৫, বা/এ) 'শিক্ষা' বিষয়ক শিরোনামে আলোচ্য ব্যক্তিগণের এ সম্পর্কিত মতামত প্রতিফলিত হয়েছে।
২৭. 'অভ্যর্থনা' : অধ্যাপক আবদুর হক চৌধুরী এম.এ., 'শিখা', ৫ম বর্ষ,১৩৩৮, উদ্ধৃত : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত* (১৯৩১-১৯৪৭), ২য় খণ্ড, ২০০৫, বা/এ, ঢাকা, পৃ. ২৪

২৮. *আবেহায়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৫-৪৬
২৯. ঐ, পৃ. ৫৫৬
৩০. ঐ, পৃ. ৫৫৬-৫৫৭
৩১. মীর মশাররফ হোসেন, 'আমার জীবনী', কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত *মশাররফ রচনা-সম্ভার*, ৫ম খণ্ড, ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৪৬-১৪৭
৩২. ভূঁইয়া ইকবাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৩৩. *আবেহায়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৭
৩৪. ঐ, পৃ. ৫৭৩
৩৫. ঐ, পৃ. ৫৭৪
৩৬. ঐ, পৃ. ৫৭৬
৩৭. *আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮
৩৮. *আবেহায়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৬
৩৯. ঐ, পৃ. ৭৪০
৪০. ঐ, পৃ. ৫৮৪
৪১. ঐ, পৃ. ৫৮৭
৪২. ঐ, পৃ. ৫৯৯
৪৩. ভূঁইয়া ইকবাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
৪৪. ঐ, পৃ. ২০০
৪৫. রশীদ আল ফারুকী, *ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব*, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৪৭
৪৬. *আবেহায়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৫
৪৭. *আত্মকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৭-৪০৯
৪৮. রশীদ আল ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৪৯. নুরুল আমিন, *আবুল মনসুর আহমদের কথাসাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
৫০. ঐ, পৃ. ৭৪
৫১. হাসান আজিজুল হক, *কথাসাহিত্যের কথকতা*, একুশে, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৫
৫২. ক্ষেত্রগুপ্ত, *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ. ৭-৮
৫৩. *আবেহায়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৭